①

রাষ্ট্র ও সমাজদর্শন   CC-6

গণতন্ত্র কাকে বলে? প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ও পরোক্ষগণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য দেখাও. গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তগুলি আলোচনা করো।

→ গণতন্ত্র বলতে বোঝায় এক ধরনের শাসনব্যবস্থা, যে শাসন ব্যবস্থায় জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা ও নীতি গ্রহণ বা নির্ধারণ করে, সেই শাসন ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলে। এই অর্থে গণতন্ত্র কেবল শাসনব্যবস্থাই নয়, তা একটি রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি। Demos এবং Kratos এই দুটি গ্রীক শব্দ থেকে ইংরেজি Democracy শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে। যার বাংলা প্রতিশব্দ হল গণতন্ত্র। গ্রীক শব্দ Demos এর অর্থ হল জনগণ। Kratos এর অর্থ হল শাসন বা কর্তৃত্ব, কাজেই Democracy শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হল জনগণের শাসন।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা সম্পর্কে 'আব্রাহাম লিঙ্কনের' সংজ্ঞাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা গ্রহণযোগ্য। লিঙ্কনের মতে — "গণতন্ত্র হল জনগণের কল্যাণে, জনগণের দ্বারা পরিচালিত জনগণের সরকার হল, ("Government of the people by the people and for the people")"

গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য : লিঙ্কনের সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে, গণতন্ত্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রথমত, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার লক্ষ্য জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করা, কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নয়।

দ্বিতীয়ত, জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করবে।

তৃতীয়ত, এই শাসনব্যবস্থায় নারীপুরুষ, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই সমান মর্যাদা ও সুযোগের অধিকার।

চতুর্থত, ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্য, স্বাধীনতা, ইত্যাদি হল গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। * অর্থনৈতিক সাম্য, আইনগত সাম্য, রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সাম্য।

গণতন্ত্রের প্রকারভেদ : গণতন্ত্রের প্রধানত ২টি রূপ লক্ষ্য করা যায়, ১. প্রত্যক্ষগণতন্ত্র ২. পরোক্ষগণতন্ত্র, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র হল গণতন্ত্রের বিশুদ্ধরূপ, পরোক্ষগণতন্ত্র হল প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র, প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র আবার বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, —
ক) উদারনৈতিক গণতন্ত্র,
খ) সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ও পরোক্ষ গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র হল এমন এক ধরনের শাসনব্যবস্থা যে শাসন ব্যবস্থায় জনগন সরাসরি শাসন কার্যে অংশগ্রহন করে। এই ধরনের গণতন্ত্রে প্রতিবছর রাষ্ট্রের জনগণ একটি নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আইন প্রনয়ন ও নীতি নির্ধারন করে। প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

অপরদিকে, পরোক্ষ গণতন্ত্র বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র হল এমন এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা যেখানে জনসাধারন সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে। এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় জনগন নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাদের নির্ধারিত বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ~~শাসনব্যবস্থা~~ শাসন ক্ষমতাকে কার্যকর করে।

এই দুই প্রকার শাসনব্যবস্থার মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করা যায়।

(১) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র অত্যন্ত সরল পদ্ধতি, তাই আইন প্রনয়ন বিল উত্থাপন ও অনুমোদনের ব্যাপারে কোনো জটিল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়না।

কিন্তু পরোক্ষ গণতন্ত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত শাসনকক্ষে আইন প্রনয়ন ও বিল উত্থাপনের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হয়। তাই এই শাসনব্যবস্থা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের তুলনায় অনেক জটিল।

(২) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়না, তাই সরকারি কাজ ও শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিরাট অর্থ ব্যয়-এর ব্যাপার থাকেনা।

পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য বিরাট অর্থের প্রয়োজন হয়। সুতরাং এই শাসন ব্যবস্থা ব্যয় বহুল।

(৩) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে ~~প্রশাসনিক কাঠামো~~ জনগন সরাসরি অংশগ্রহন করে বলে বহুদলীয় ব্যবস্থা থাকে।

অপরদিকে পরোক্ষ গণতন্ত্রে বহুদলীয় ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

POCO M2PRO KAKOLI

(4) (৩) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কেবলমাত্র ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র দেশ বা নগর রাষ্ট্রে প্রয়োগ করা গেলেও বর্তমান অধিক জনবহুল রাষ্ট্রে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

~~পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রশাসনিক কাঠামো গঠনের জন্য বিরাট অর্থের প্রয়োজন হয়। সুতরাং এই শাসন ব্যবস্থা ব্যয়বহুল।~~

পরোক্ষ গণতন্ত্র অধিক জনবহুল রাষ্ট্রে প্রয়োগ করা ~~মিলিত~~ হয়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন জটিল সমস্যাও তার সমাধানের জন্য বিচক্ষণ প্রশাসক ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজ্ঞের প্রয়োজন। সেই ক্ষেত্রে পরোক্ষ গণতন্ত্র হল একমাত্র ভিত্তি।

(5) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে সকল নাগরিকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

~~পরোক্ষ গণতন্ত্রে সকল নাগরিকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে~~

পরোক্ষ গণতন্ত্রে সকল নাগরিককে সমমর্যাদা ও সমসুযোগ দেওয়া হয়। অর্থাৎ সাম্য স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি অধিক বেশি সুরক্ষিত হয়।

৩

1. গণতান্ত্রিক আদর্শ বা রাজনৈতিক আদর্শ কাকে বলে? *

⇒ গণতান্ত্রিক আদর্শ বলতে বোঝায় সমাজ বা সম্প্রদায়ের নিম্নশ্রেণির দ্বারা অর্থাৎ অধিকাংশ ব্যক্তির দ্বারা শাসনব্যবস্থা বা সরকার।

* গণতান্ত্রিক আদর্শের বৈশিষ্ট্য গুলি হল —

1. ব্যক্তির বা নাগরিকের সর্বাধিক স্বাধীনতার সুযোগ, তবে সে ক্ষেত্রে এক জনের স্বাধীনতা যেন অন্য জনের স্বার্থবিরোধী না হয়।

2. গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে প্রত্যেক মানুষের চিন্তা, বাক্ ও কর্মের স্বাধীনতা দেওয়া অতি আবশ্যক, তবে সেই স্বাধীনতা যে অন্যের স্বার্থবিরোধী না হয়।

POCO
2024/11/16 11

৩. সাম্য অর্থাৎ সকল ব্যক্তি বা দলকে আইনের কাছে সমমর্যাদা সমানরূপে গ্রহণ করা, (শিক্ষা, জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম ও ইত্যাদি নির্বিশেষে),

~~ধর্ম, জাতি~~, ধনী-নির্ধন, ভদ্র-ইতর, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ রাষ্ট্রের কাছে সমান মর্যাদার পাত্র। এবং তারা প্রত্যেকেই সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারী— এমন সাম্যনীতি-ই হল গণতান্ত্রিক আদর্শ।

+২ / +৫

সমাজ বিজ্ঞান ও সমাজ দর্শনের মধ্যে পার্থক্য ?

→ মানুষ সমাজবদ্ধ জীব রূপে পরিচিত, সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে যে সকল সম্বন্ধ গড়ে ওঠে এবং ঐ সকল পারস্পরিক সম্বন্ধ থেকেই যে সকল ক্রিয়া ও ঘটনার উদ্ভব হয় এবং যে সকল সামাজিক পরিবর্তন বিবর্তন ও অগ্রগতি ঘটে সে সকল বিষয়ের যে সু-শৃঙ্খল আলোচনাকে বলা হয় সমাজবিজ্ঞান।

সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়গুলি হল — সমাজের উৎপত্তি, গঠন, ক্রমবিকাশ, রীতিনীতি, নিয়মকানুন, প্রথা, ধর্ম, শিক্ষা, অনুষ্ঠান বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়াকলাপ।

অপরপক্ষে, সমাজ দর্শন হল - সমাজ বিজ্ঞান ও দর্শনের মিলন স্থল। সমাজ বিজ্ঞানে কেবল সমাজের বাস্তব প্রকৃতি আলোচনা করা হয়। কিন্তু কোন আদর্শ অনুযায়ী সমাজ পরিচালিত হওয়া উচিত তার নির্দেশ থাকেনা। অথচ সমাজজীবনের আলোচনা পূর্ণাঙ্গ করতে হলে এর আদর্শ, উদ্দেশ্য ও মূল্যের আলোচনা আবশ্য। সমাজ দর্শন সমাজজীবনের এই সব আদর্শ ও উদ্দেশ্য ও মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনা করে।

POCO
M2PRO❤️KAKOLI🖤❤️
2024/11/16 11:5

উদারনৈতিক গণতন্ত্র

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সবদেশেই উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। বর্তমানে প্রায় সবদেশেই এই শাসন ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা উন্নত শাসন ব্যবস্থা রূপে স্বীকৃত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ভারতবর্ষ, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত।

বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকেই উদারনৈতিক গণতন্ত্রের উদ্ভব। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লব অথবা ফরাসি বিপ্লবের কিছু কাল পরেও এই বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। এই সময় মধ্যবিত্তশ্রেণী ও ব্যবসায়ী শ্রেণী পুঁজিপতিরা অপরকে শোষণ ও নিপীড়িত করে প্রচুর বিত্তবান হয়, এবং বিত্ত ও পদ-মর্যাদার প্রভাবে দেশের শাসন ব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থে প্রয়োগ করে, এবং জনগনের স্বার্থ অবহেলিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের এই প্রকার বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকেই উদারনৈতিক গণতন্ত্রের উদ্ভব হয়। বৃটেন দেশের সংবিধানেই সর্বপ্রথম উদারনৈতিক গণতন্ত্র সংবিধান রূপে চিহ্নিত হয়। পরবর্তী সময় বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

উদারনৈতিক গণতন্ত্র সর্বাধিক গুরুত্ব পেলেও সংক্ষিপ্তভাবে এই গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে এই গণতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করা যায়, তবে এই গণতন্ত্রে সাম্য, স্বাধীনতা ও অধিকারকে শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তিরূপে গণ্য করা হয়। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল —

১. রাজনৈতিক সাম্য স্বীকৃত হলেও অর্থনৈতিক সাম্যকেও তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

২. রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, প্রত্যেক নাগরিকের জীবনের, সম্পত্তির, শিক্ষার, ধর্মের, বৃত্তি নির্বাচনের অধিকারকে স্বীকার করা হয়,

৩. অর্থনীতির ক্ষেত্রে অবাধ বানিজ্য নীতির পরিবর্তে পরিকল্পিত বানিজ্য নীতি গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পিত বানিজ্য নীতিতে কয়েকটি মাত্র শিল্পকে সরকারি নিয়ন্ত্রনে রাখা হয়। এবং অন্যান্য শিল্পকে বেসরকারি সংস্থার অধীনে রাখা হয়,

৪. বহু দলীয় শাসনব্যবস্থাকে স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ একাধিক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সেই সব দল রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অধিকার অর্জনের জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল রাষ্ট্র-ক্ষমতা ভোগের অধিকার অর্জন করে।

5. জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভের পথ খোলা থাকে।

6. নির্ধারিত মেয়াদ পেরিয়ে গেলে আবার সার্বজনীন ভোটের মাধ্যমে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উদারনীতিক গণতন্ত্র প্রকৃত পক্ষে জনমতের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি গণতন্ত্র। কেননা, জনগণ ভোটের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা জনবিরোধী হলে জনগণ ভোটের মাধ্যমে সরকারকে অপসারিত করতে পারে।

7. সরকারি নীতির বিরোধীতা করার বা সমালোচনা করার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তাছাড়া গণমাধ্যমগুলিকে — সংবাদপত্র, বেতার, দুরদর্শন প্রভৃতিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখা হয়, যাতে তারা নিরপেক্ষভাবে সরকারের নীতির সমালোচনা করতে পারে।

8. সর্বোপরি, আদালতকেই সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করা হয়, সরকারের দ্বারা নাগরিকের মৌলিক অধিকার আঘাত পেলে দেশের সর্বোচ্চ আদালত তার সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করে সেই অধিকারকে সুরক্ষা করতে পারে।

সমালোচনা

উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সাম্য, স্বাধীনতা ও অধিকারের কথা উল্লেখ থাকলেও কার্যত সেগুলো রক্ষিত হয়না।

প্রথমত, এই গণতন্ত্রে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকার সব নাগরিকের সমান হয়, — সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদা ভেদে তা কমবেশি হয়।

দ্বিতীয়ত, এই গণতন্ত্রের রক্ষা কবজরূপে যে সব গণমাধ্যমগুলিরয়েছে কার্যত তাদের কোনো ভূমিকা থাকেনা কেননা অনেকসময় গণমাধ্যমগুলি সরকারের বশীভূত হয়, ফলে জনমত অবহেলিত হয়।

তৃতীয়ত, এখানে যোগ্যতা অপেক্ষা প্রতিযোগীতা বেশিগুরুত্ব পায়। ফলে ধনীর ধন এবং দরিদ্রের দারিদ্র ক্রমশই বৃদ্ধি পায় তার পরিস্থিতি বেকারত্ব, অর্থনৈতিক মন্দা এবং মুদ্রাস্ফীতি।

সম্প্রদায় কী? এর বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? ✱

মানবজীবনের একটি অন্যতম রূপ হল সম্প্রদায়, সমাজতাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের মতে যখন কোনো জনসমষ্টি তাদের সংঘবদ্ধজীবনে সামগ্রিক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে একত্রে বসবাস করে, তখন সমাজের সেই জনসমষ্টিকে সম্প্রদায় বা Community বলে। ম্যাকাইভার ও পেজ তাঁদের 'Society' নামক গ্রন্থে সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন –

"ছোটো অথবা বড়ো গোষ্ঠীর সদস্যগণ যখন এমন ভাবে বসবাস করে যে তারা বিশেষ কোনো স্বার্থের অংশীদার না হয়ে একটি সার্বিক জীবনের চাহিদাগুলির অংশীদার হয়, তখন আমরা ঐ গোষ্ঠীকে সম্প্রদায় বলি।"

অর্থাৎ এই সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে, – ম্যাকাইভার ও পেজ-এর মতে সম্প্রদায় হল – এমন এক মানবগোষ্ঠী যার সদস্যরা অবিরাম তথা জীবনের প্রাথমিক চাহিদাগুলি মেটাবার উদ্দেশ্যে একত্রে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে।

ম্যাকাইভার ও পেজ এর মতে সম্প্রদায়ের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল –

1. সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষের যাবতীয় সামাজিক সম্পর্কের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে,

2. সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষের সমগ্র জীবনটাই অতিবাহিত হতে পারে।

3. সম্প্রদায় তার সদস্যদের সমস্ত মৌল প্রয়োজন পূরণ করে, কিন্তু তার পরিবারের মধ্যে, মানুষ – তার গ্রাম বা শহরের মধ্যে, অথবা তার উপজাতির মধ্যে থেকে সবরকম প্রয়োজন মেটাতে পারে,

4. সম্প্রদায়ের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকে, যেখানে সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যরা একত্রে বসবাস করে।

5. একই ভূখণ্ডে পাশাপাশি বসবাস করার জন্য সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধনের উৎপত্তি হয়, যা সম্প্রদায়কে দৃঢ় ও সুসংহত করে (যা বন্ধুত্ব ও ঐক্যের মনোভাব গড়ে তোলে)।

6. স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা অনুসারে সম্প্রদায়ের ব্যাপকতা কম বেশি হয়, স্বার্থ ক্ষুদ্র হলে বৃহৎ নগরে বসবাস করলেও ব্যক্তি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, আর স্বার্থ বড়ো হলে ক্ষুদ্র গ্রামে বসবাস করেও ব্যক্তি বৃহৎ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

সম্প্রদায়ের ভিত্তি আলোচনা করো।

→ ম্যাকাইভার সম্প্রদায়ের ২ টি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি আলোচনা করেছেন, —

১. স্থান বা অঞ্চল।
২. সম্প্রদায়গত মনোভাব।

১. স্থান বা অঞ্চল :-

সম্প্রদায়ের ধারনার সাথে একটি নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড বা অঞ্চল ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থাকে। কেননা ছোটো বড়ো যেকোনো সম্প্রদায় একটি বিশেষ অঞ্চলে বা ভূখণ্ডে বসবাস করে। গ্রাম, শহর, উপজাতী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মানুষেরা সর্বদাই একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে। কোনো যাযাবর উপগোষ্ঠী যদি দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করে তাহলে তারা একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও আঞ্চলিক ভিত্তির অভাবে তাদেরকে সম্প্রদায় বলা যাবেনা। সুতরাং আঞ্চলিক ভিত্তি সম্প্রদায়ের এক অপরিহার্য ও আবশ্যিক উপাদান।

আঞ্চলিক ভিত্তির তাৎপর্য -

অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করার মতো ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় করা হয়, বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এক সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে অন্য দেশের মানুষের যোগাযোগ ঘটছে। তাই অনেকে আশঙ্কা করে যে এই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আঞ্চলিক ভিত্তিক ঐক্যের বন্ধনটি ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে। কিন্তু ম্যাকাইভারের মতে এই আশঙ্কা অমূলক। তার মতে যোগাযোগের ফলে গ্রাম সম্প্রদায়ের ঐক্যের বন্ধনটি বরং আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. সম্প্রদায়গত মনোভাব :-

আঞ্চলিক ভিত্তি ছাড়াও সম্প্রদায় গড়ে ওঠার জন্য একটি অতিরিক্ত ভিত্তিকে স্বীকার করতে হয় তাহল মানসিক ভিত্তি। এই মানসিক ভিত্তিকেই ম্যাকাইভার সম্প্রদায়িক ভিত্তি বলেছেন, একই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের ভাষাগত আচার নীতিগত, ধর্মীয়, ভৌগলিক ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকার ফলে তাদের মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্যবোধ জেগে ওঠে, তারা তাদের

POCO M2PRO KAKOLI 2024/11/16 11

১) সমাজ কাকে বলে?

⇒ মানুষ সমাজবদ্ধজীব, প্রাচীন কাল থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাস করছে। সমাজের বাইরে মানুষের জীবন কল্পনাই করা যায়না,

ম্যাকাইভার ও পেজ সমাজের সংজ্ঞা বলেছেন — "সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের জটিজাল, যা নিয়ত পরিবর্তনশীল,"

গিসবার্ট সমাজের সংজ্ঞায় বলেছেন — "সাধারনভাবে, সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের এক জটিল জাল, যে সম্পর্কের দ্বারা প্রত্যেকে তার সঙ্গীর সঙ্গে আন্তরসম্পর্কে যুক্ত থাকে",

২) পরিবার কাকে বলে? *

⇒ পরিবার হল এমন এক প্রত্যয় যার এক কথায় সংজ্ঞা দেওয়া যায়না, বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ পরিবারের বিভিন্নরকম সংজ্ঞা দিয়েছেন, ~~ম্যাকাইভার পরিবারের সংজ্ঞায় বলেছেন - "পরিবার হল এমন এক গোষ্ঠী যা যৌন সম্পর্কের দ্বারা পর্যাপ্ত ও সুনির্দিষ্ট~~

সাধারণভাবে বলা যায় — "পরিবার হল ব্যক্তিদের সেই গোষ্ঠী যারা বিবাহ, রক্তের সম্পর্ক, দত্তক গ্রহনের দ্বারা গড়ে উঠেছে, যারা একটি একক বাসগৃহ তৈরি করেছে, তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায়, তাদের নিজ নিজ সামাজিক ভূমিকা অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী, মা-মেয়ে, ভাই-বোন হিসাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে, এক সাধারন সংস্কৃতি গড়ে তোলে,"

3) বিভিন্ন প্রকার পরিবার গুলি কী কী ? *

→ পরিবার এমন একটি চিরন্তন সংগঠন যা মানব সমাজের প্রতিটি স্তরে অস্তিত্বশীল ছিল। পরিবারের বিভিন্ন প্রকার গুলি হল —

1. পিতৃশাসিত ও মাতৃশাসিত পরিবার।
2. এক বিবাহ কারী ও বহু বিবাহকারী পরিবার।
3. পিতৃ বংশানুক্রমিক এবং মাতৃ বংশানুক্রমিক পরিবার।
4. পিতৃ বাসস্থানিক ও মাতৃবাসস্থানিক পরিবার।
5. একক ও যৌথ পরিবার।

* 1. ম্যাকাইভের ও পেজ এর মতে সামাজিক শ্রেণী কী
2. শ্রেণীচেতনা কী?
3. সংঘসমিতি ও অনুষ্ঠান ~~সমিতি~~ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য।

1. সংঘসমিতি ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য লেখো —

→ প্রথমত, সংঘসমিতি এক প্রকার মানবগোষ্ঠী, আর, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ঐ সকল গোষ্ঠীকে সচল রাখে।

দ্বিতীয়ত, সংঘসমিতি হচ্ছে মানবজীবনের ~~প্রবণতা, আর~~, উপাদান আর, অনুষ্ঠান সেই উপাদানের আকার দেয়।

তৃতীয়ত, সংঘসমিতি সমাজের স্থিতিশীল দিক আর, অনুষ্ঠান তার গতিশীল দিক।

চতুর্থত, সংঘসমিতি মাত্রই কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে, আর, অনুষ্ঠান হচ্ছে সেই লক্ষ্য লাভের উপায়।

পঞ্চমত, আমরা সংঘসমিতির মধ্যে বসবাস করি, আর অনুষ্ঠানের মধ্যে কা... কর

২. প্রত্যক্ষ গনতন্ত্র ও পরোক্ষ গনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য —

→ প্রথমত, প্রত্যক্ষ গনতন্ত্র অত্যন্ত সরল পদ্ধতি। কিন্তু পরোক্ষ গনতন্ত্র হল অত্যন্ত জটিল পদ্ধতি।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষ গনতন্ত্রে জনগন সরাসরিভাবে অংশগ্রহণ করে বলে বহুদলীয় ব্যবস্থা থাকেনা, কিন্তু, পরোক্ষ গনতন্ত্রে বহুদলীয় ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়,

তৃতীয়ত, প্রত্যক্ষ গনতন্ত্রে কেবলমাত্র ক্ষুদ্র দ্বীপ বা নগরে প্রয়োগ করা গেলেও আধুনিক জনবহুল রাষ্ট্রে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, কিন্তু, পরোক্ষ গনতন্ত্র আধুনিক জনবহুল রাষ্ট্রে প্রয়োগ করা হয়।

চতুর্থত, প্রত্যক্ষ গনতন্ত্রে সমাজের সকল নাগরিকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার করা সম্ভব হয়না, কিন্তু, পরোক্ষ গনতন্ত্রে সকল নাগরিককেই সমমর্যাদা দেওয়া হয়,

৩. গনতান্ত্রিক আদর্শের বৈশিষ্ট্য লেখো।

→ প্রথমত, সকল ব্যক্তির বা নাগরিকের সমান স্বাধীনতার সুযোগ। তবে সেক্ষেত্রে একজনের স্বাধীনতা যেন অপরজনের স্বার্থ বিরোধী না হয়।

দ্বিতীয়ত, গনতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে প্রত্যেক মানুষের চিন্তা, বাক ও কর্মের স্বাধীনতা দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। তবে ঐ স্বাধীনতা যেন অন্যের স্বার্থবিরোধী না হয়,

তৃতীয়ত, সাম্য অর্থাৎ সকল ব্যক্তিকে বা নাগরিককে সমমর্যাদা সম্পন্নরূপে গ্রহন করা, (শিক্ষা, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ ইত্যাদি ক্ষেত্রে,

৪) ম্যাকাইভার ও পেজ এর মতে সামাজিক শ্রেণী কী

→ ম্যাকাইভার ও পেজ তাঁর Society গ্রন্থে বলেন, সামাজিক শ্রেণী বলতে বোঝায় সম্প্রদায়ের এমন এক ধাঁচ্যাংশ যা মর্যাদা অনুসারে অন্যান্য অংশ থেকে স্বতন্ত্র।

প্রথমত, উঁচু নীচু ধাপে অবস্থান করে,

দ্বিতীয়ত, শ্রেনীমর্যাদা সমাজস্বীকৃত হয়, এবং শ্রেনীর সদস্যরা মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন থাকে।

তৃতীয়ত, সামাজিক শ্রেনীর সাংগঠনিক স্থায়িত্ব থাকে।

POCO
M2PRO KAKOLI
2024/11/

কাল্পনিক সমাজতন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য?

→ ইংরেজি শব্দ 'Utopia' শব্দটির অর্থ হল কাল্পনিক আদর্শরাষ্ট্র বা দেশ। কাল্পনিক সমাজতন্ত্র এক পূর্ণ নির্দোষ ও ত্রুটিবিহীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা প্রচার করে। প্লেটো 'The Republic' নামক গ্রন্থে একটি আদর্শ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কল্পনা করেছিলেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিখ্যাত লেখক টমাস মোর তাঁর 'Utopian' গ্রন্থে এক আদর্শ রাষ্ট্রের চিত্র অঙ্কন করেছেন। সমাজ বা রাষ্ট্র সম্পর্কে এসব দার্শনিক ও সমাজসংস্কারকদের কল্পিত সমাজ ব্যবস্থাকে বলা হয় কাল্পনিক সমাজতন্ত্র। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের উদ্ভাবক ও প্রচারক যে তিনজনের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন সাঁ সিমোঁ, চার্লস ফুরিয়ে এবং রবার্ট ওয়েন। ফরাসি বিপ্লবের ব্যর্থতা এবং ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের প্রভাব - এর ফলে সমাজ জীবনে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন হয় তা লক্ষ্য করেই তাঁরা এক নিষ্কলুষ সমাজের কল্পনা করেন। যে সমাজে কোনো অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য থাকবেনা, শোষণ ও অত্যাচার থাকবে না, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার শ্রমের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী লাভ করে সুখে শান্তিতে জীবন নির্বাহ করবে, এরজন্যে মানুষের বিবেকবুদ্ধির কাছে আবেদন করে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে হবে, কিন্তু পুঁজিপতিদের কাছে এই আবেদন জানিয়ে তাদের অন্তঃশুদ্ধির মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া — এক ভিত্তিহীন প্রত্যাশা মাত্র। তাই এই মতবাদকে বলা হয় কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদ।

অপরদিকে মার্কস যে সমাজতন্ত্রের উল্লেখ করেন তা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নামে পরিচিত। কার্ল মার্কস যে সমাজতন্ত্রের উল্লেখ করেন তা বিজ্ঞান সম্মত মতবাদ কেননা তা ইতিহাসভিত্তিক ও তথ্যনির্ভর। সাঁ সিমোঁ, ফুরিয়ে, ওয়েন প্রভৃতি তাত্ত্বিকগণ পুঁজিবাদি সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর দুঃখ, কষ্ট ও সীমাহীন দারিদ্র্যের উল্লেখ করলেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেননি।

সমাজতন্ত্রের ধারণায় উপনীত নিছক কল্পনার উপর ভিত্তি করে মার্কস হননি, ইতিহাসের তথ্যের উপর নির্ভর করেই এ ধারণায় উপনীত হয়েছেন। মার্কসের মতে মানুষ যে পরিবারে বাস করে সেটাই হল তার বস্তুময় সত্তা, আর ঐ সত্তাই মানুষের সামগ্রিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের জীবনে বস্তুময় পরিবেশ অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনই প্রধান, কেননা তার জীবনের অপরাপর দিকগুলিকে - রাজনৈতিক অবস্থা, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি দিকগুলিকে প্রভাবিত করে। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য শ্রেণীদ্বন্দ্ব হয়। এই শ্রেণীদ্বন্দ্ব চিরন্তন হতে পারেনা। মার্কস বলেন — এমন একদিন অবশ্যই আসবে যেদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক কৃষক মানুষেরা, সর্বহারা শ্রেণী - সংখ্যালঘিষ্ঠ পুঁজিপতি শ্রেণীকে পরাজিত করে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা অধিকার করবে। এইভাবে একদিন সব দেশেই সর্বহারা গোষ্ঠীর দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাবে ও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা হবে।

উল্লেখযোগ্য যে — কাল্পনিক সমাজতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করলেও অবশেষে কল্পনারই আশ্রয় নিয়েছেন, এমন একদিন আসবে — এবং কল্পনাভিত্তিক প্রত্যাশামাত্র। মূলগতভাবে ... কাল্পনিক ...

(৩)

গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলি আলোচনা করো। অথবা, গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্ত।

গণতন্ত্রকে সফল করতে আবশ্যিক শর্তগুলি পূরণ করতে হবে। —

প্রথমত, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, ধর্ম, নির্ভয়ে গণতন্ত্রকে সফল করার জন্য প্রত্যেক নাগরিকের মতামত, কথা বলার ও কাজ করার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষা, সাফল্যের অন্যতম প্রয়োজনীয় শর্ত জনগণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও গণতন্ত্রের প্রতি জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত না হলে জনগণ যথার্থভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে না। যারা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপরিচালনার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের এক প্রয়োজনীয় শর্ত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। অর্থনৈতিক দিক থেকে জনগণ স্বাধীন না হলে গণতন্ত্র প্রহসনে পরিণত হয়।

চতুর্থত, সংবিধান, গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম শর্ত লিখিত সংবিধানের অস্তিত্ব। সংবিধানে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য, সরকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলি লিপিবদ্ধ না থাকলে শাসকগণ সহজেই সংবিধান বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে শাসনব্যবস্থায় জটিলতা দেখা যায়।

পঞ্চমত, বিরোধী দলের অস্তিত্ব, গণতন্ত্রের সাফল্যের এক অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হল বিরোধী দলগুলির অস্তিত্ব। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে বহু দল থাকায় বিরোধী দলের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হয়। বিরুদ্ধ মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার মাধ্যমেই গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভরশীল।

পরিশেষে বলা যায় গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকতে হবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার উন্মেষ ~~থাকতে হবে~~ ঘটাতে হবে। প্রত্যেক নাগরিককে নিজের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে। এর জন্য চাই সৎ ও আদর্শবাদী নেতা, যারা দেশের কাজে জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে পারবে। তাহলেই গণতন্ত্রের সাফল্য অনিবার্য।

জাতি কাকে বলে ? জাতিভেদ প্রথার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

স্যার 'Edward Blunt' তাঁর 'Social service in India' গ্রন্থে জাতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন — জাতি হল এমন এক জনগোষ্ঠী যাদের মধ্যে অন্তর বিবাহ প্রথা প্রচলিত, যারা বংশ পরম্পরায় এক সাধারণ পদবি গ্রহণ করে, যারা সামাজিক আচার আচরণের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিধিনিষেধ অনুসরণ করে, যারা গতানুগতিক ভাবে পূর্বপুরুষের বৃত্তি গ্রহণ করে এবং যারা মনে করে তাদের আদি পূর্বপুরুষ একই ব্যক্তি — এভাবে তারা এক সুসংহত গোষ্ঠী জীবন যাপন করে।

ভারতে বসবাসকারী জাতি এবং জাতিভেদ প্রথা কেবলমাত্র মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাতে জাতিভেদ প্রথার চরম আকার দেখতে পাই। তবে এখানে জাতিভেদ প্রথা বলতে ভারতীয়দের তথা ভারতে বসবাসকারি হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক শ্রেণীভেদকেই বোঝানো হয়েছে।

বর্তমান ভারতে জাতিভেদ প্রথার বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায়।

i) **বংশানুক্রমিতা**, প্রত্যেক মানুষ জন্মসূত্রে তার জনকের জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়। ধনসম্পদ অর্জনের দ্বারা ব্যক্তি কোনোভাবেই স্বজাতির মর্যাদাকে অতিক্রম করতে পারে না অর্থাৎ জন্মসূত্রের দ্বারাই জাতি নির্ধারিত হয়।

ii) **ক্রমোচ্চতা**, ভারতীয় জাতিভেদ প্রথার অপর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল উঁচু-নীচু বা মান মর্যাদা অনুসারে জাতিগুলি বিন্যস্ত থাকে।
যেমন - প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণের স্থান সবার উর্দ্ধে এবং সর্বনিম্নে শূদ্রের স্থান। ভারতীয় জাতিভেদ প্রথার এই ক্রমোচ্চ নিয়মটি বর্তমান সমাজেও অব্যাহত আছে।

iii) **অন্তর বিবাহ প্রথা**, প্রত্যেক জাতির অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্বজাতির গণ্ডির মধ্যে সীমিত থাকে। প্রাচীনকালে উঁচু জাতির সাথে নীচু জাতির বৈবাহিক সম্পর্ক কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ ছিল, যদিও আধুনিক হিন্দু সমাজে এই কঠোরতা অনেক পরিমানে হ্রাস পেয়েছে।

ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য...

মানুষ হল সামাজিক জীব, সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককেই বলা হয় সামাজিক সম্পর্ক। এই সামাজিক সম্পর্কের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল — পারস্পরিক সচেতনতা। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে অনেকগুলি মতবাদ প্রচলিত আছে — তারমধ্যে অন্যতম হল — ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মতবাদ।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ — এই মতানুযায়ী সমাজ হল — বিভিন্ন স্বাধীন ব্যক্তিদের গড়া একটি সংগঠন। এখানে ব্যক্তি তার নিজের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সাধনের জন্য সমাজ তৈরি করেছে। কারণ ব্যক্তির প্রয়োজনেই সমাজের সৃষ্টি, সমাজের প্রয়োজনে ব্যক্তির উৎপত্তি হয়নি। এই মত অনুসারে সমাজ এক কৃত্রিম সংগঠন আর সমাজ যেহেতু কৃত্রিম বা যান্ত্রিক সংগঠন, তাই ব্যক্তি মধ্যে সমাজের সম্পর্কও কৃত্রিম বা যান্ত্রিক, সমাজ আদিম মানুষের বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এক চুক্তি দ্বারা তৈরি হয়েছিল। ~~এই মতবাদের প্রবক্তা হলেন~~

এই মতবাদের প্রবক্তা হলেন তিন জন বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী — হবস, লক ও রুশো। তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে কিছু মূল ও মতপার্থক্য থাকলেও তারা সকলেই একমত পোষণ করেন যে — সমাজের অস্তিত্বের আগে মানুষ প্রাক্‌-সামাজিক অবস্থায় বাস করত যাকে প্রকৃতির রাজ্য বলা হয়। এবং আদিম মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি সাধন করেই সমাজের সৃষ্টি করেছে।

টমাস হবস-এর মত :- তাঁর মতে মানুষ যখন প্রাক্‌ সামাজিক প্রকৃতির রাজ্যে বাস করত, তখন সে ছিল স্বার্থপর, লোভি, নিষ্ঠুর এবং সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যই ছিল প্রধান কাম্যবস্তু, যেহেতু তখন কোনো রাষ্ট্র, আইন কানুন উদ্ভব হয়নি তাই মানুষ স্বাধীনভাবে, অন্যের সম্পত্তি লুট করে, অত্যন্ত পাশবিক নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করত, তখন একটি মাত্রই প্রাকৃতিক আইন ছিল — 'Might is right' / 'জোর যার মুলুক তার'। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর পরিবেশের হাত থেকে মুক্তি ও আত্মরক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ বাধ্য হল সামাজিক চুক্তি করতে। এই চুক্তির দ্বারাই গড়ে উঠল সুসংবদ্ধ সমাজ।

জন লক এর মত :—

লক - আদি প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের জীবনের বর্ণনায় হবস্‌ - এর ঠিক বিপরীত মত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন প্রাকৃতিক অবস্থাতেও মানুষ শান্তি, শৃঙ্খলা ও পারস্পারিক সহযোগিতা বসবাস করত। প্রতিটি মানুষই স্বাধীনভাবে তার যুক্তি বিচারবোধ এবং বিবেকের অনুশাসন মেনে চলত। ফলে কেউই অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতনা। সকলেই সমান অধিকার ভোগ করত। কিন্তু সেই অবস্থায় শাসন ও আইন ব্যবস্থার অভাব ছিল। এই জন্য মানুষ সকলে মিলে একটি সামাজিক চুক্তি সম্পাদন করল। এবং সমাজ গড়ে তুলল। তারপর, জনকল্যানের জন্য ও আইন প্রনয়নের জন্য একটি সরকার গঠন করল। যার হাতে শাসনকার্য পরিচালনায় দায়িত্ব ও ক্ষমতা তুলে দেওয়া হল।

রুশোর মত :—

রুশোর মতে প্রাক্‌ সামাজিক প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ সুন্দর, সহজ সরল, উদার ও মুক্ত জীবনযাপন করত, প্রকৃতির রাজ্য ছিল ভূস্বর্গ। কিন্তু এই অবস্থায় বেশিদিন বসবাস করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হলনা। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সূচনা, মানুষের চিন্তা চেতনাহির ফলে প্রকৃতির রাজ্যে সাম্য ও সুখ শান্তি বিঘ্ন হল এবং অশান্তি হিংসা বৈষম্য ও জটিলতার সৃষ্টি হল। ফলে সংঘর্ষ, বিবাদ, হত্যা, এক অরাজক অবস্থার জন্ম নিল, এরকম অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ সম্মত হয়ে এক চুক্তির দ্বারা নিজেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সমষ্টিগত ইচ্ছাতে পরিনত হল, এবং এইভাবেই সমাজ গড়ে উঠল।

সমালোচনা –

এই মতবাদ একটি ভ্রান্ত ধারনার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, কারন এই মতানুযায়ী ব্যক্তি সমাজ বহির্ভূত হয়ে এবং সম্পূর্ন জীবন যাপন করতে পারে।

কিন্তু এই বক্তব্য মেনে নেওয়া যায়না, কারন সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যতায় রাখতে পারেনা, কারন ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত।

সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে মার্কসের মতবাদ আলোচনা করো অথবা মার্কসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ আলোচনা করো —

⇒ কার্ল মার্কস (Marx) প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বলা হয়। চার্লস ডারউইন যেমন জীবজগতের বিবর্তননীতি আবিষ্কার করেছিলেন, মার্কস ও তেমনি ইতিহাসের বিবর্তনের মূল সূত্রটি আবিষ্কার করেন। তার সমাজ চিন্তা ছিল ইতিহাসভিত্তিক ও তথ্যনির্ভর। সমাজচিন্তাকে কল্পনার প্রকোষ্ঠ থেকে মুক্ত করে বাস্তবভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্যই মার্কস এর সমাজতন্ত্রকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বলা হয়।

মার্কস তার 'দাস ক্যাপিটাল' নামক গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সমাজের পরিবর্তন ও সেই পরিবর্তনের চরিত্র সম্পর্কে মার্কস এর দুটি আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। —
১. ইতিহাসের বস্তুবাদি ব্যাখ্যা,
২. উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব।

তারমতে এই দুটি তত্ত্বকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারলেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হবে, সুতরাং এই দুটি তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজনে আছে। —

১. ইতিহাসের বস্তুবাদি ব্যাখ্যা বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ —

মার্কস ইতিহাসের বস্তুবাদি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তিনি বলেন মানুষ যে পরিবেশে বাস করে সেটাই হল তার বস্তুময় সত্তা। এই বস্তুগত সত্তাই মানুষের জীবনবোধ, আচার, আচরণ, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের বোধ, বা চেতনা ঐ বস্তুগত সত্তাকে নিয়ন্ত্রিত করেনা।

পরিবেশের বস্তুগত সত্তা বলতে বোঝায় — উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার সম্পর্ককে। সমাজে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের মৌল চাহিদাগুলি — (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান) পূরণ করার জন্য মানুষকে উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ করতে হয়, মার্কস যাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলেছেন। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই হল সমাজের মূল চালিকা শক্তি।

উৎপাদন ব্যবস্থার দুটি উপাদান হল উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক। উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী মানুষ ও তাদের শ্রমশক্তির যোগফল হল উৎপাদন শক্তি, অপরদিকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একজন মানুষের সঙ্গে অপর জন মানুষের যে সম্পর্ক তাকে বলা হয় উৎপাদন সম্পর্ক। এই দুটি - উৎপাদন শক্তি ও সম্পর্ক - এর মধ্যে সংগতি থাকলে উৎপাদন কার্য চলতে থাকে — একে বলে বাদ, আর যদি অসঙ্গতি দেখা যায় - মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় — একে বলে প্রতিবাদ। এরফলে শ্রেণী দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।

এবং ... সমাজে মানুষের ... বলে সমাজ। এইভাবেই ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

মার্কস বলেন, এইভাবেই বাদ, প্রতিবাদ ও সম্বাদের মধ্য দিয়ে একদিন পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জন্ম নেবে।

2.) ~~উদ্বৃত্ত~~ উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব –

সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে মার্কসের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল – উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব। নির্ধারণ বা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা কিভাবে শোষণ করে শ্রমিকদের বঞ্চিত করে তা নির্ধারণ করা। উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রম হল একটি উপাদান। পুঁজিপতিরা শ্রমিকের সেই শ্রমকে একটি নির্দিষ্ট অর্থে ক্রয় করে। এবং চুক্তিমতো শ্রমের থেকে বেশি পরিমান শ্রম করতে বাধ্য করে। ফলে এই অতিরিক্ত শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের মূল্য শ্রমিকরা পায়না। পুঁজিপতিরা সবটাই লাভের অংশ বা উদ্বৃত্ত মূল্য হিসাবে ~~লাভের~~ আত্মসাৎ করে।

এই অমানবিক যন্ত্রনা দীর্ঘকাল চলতে পারেনা। তাই ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে এই শ্রমিক শ্রেণী সংগঠিত হয়ে পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ করবে, এর ফলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

সমালোচনা – মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে প্রভাবিত করেছে। তবে এই মতবাদের বিরুদ্ধে কিছু আপত্তি আছে।

1. মার্কস প্রচলিত অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজ শ্রেণী বিভাজনের কথা বলেছেন। কিন্তু এই মত গ্রহণ যোগ্য নয়। সামাজিক পদমর্যাদা বা জীবনধারার পার্থক্য অনুসারে শ্রেণী বিভাজন ঘটে।

. জার্মান দার্শনিক ~~কার্ল পপার~~ Carl popper – মার্ক্সের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাকে 'ইতিহাসবাদ দুষ্ট' বলে অভিযোগ করেছেন। কারন মার্কস যেভাবে বাদ, প্রতিবাদ ও সম্বাদের ~~স~~ মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়েছেন তার ফলে ইতিহাস লক্ষ্যাভিমুখী হয়ে পড়ে, লক্ষ্য কেবল চেতন সত্ত্বার থাকতে পারে। সুতরাং মার্কসের মত দোষে দুষ্ট।

উপরোক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও বলা যায় সমাজতন্ত্র কোনো বিকল্প নেই, তা হল শ্রমজীবি মানুষের শোষণ ও অত্যাচার পীড়ন থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র পথ।

KAKOLI🖤❤️

ব্যক্তি ও সমাজের ...

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে, যেসব বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে, তাদের মধ্যে প্রাচীনতম মতবাদ হল আঙ্গিক মতবাদ। এ মতবাদ অনুসারে জীবদেহের সঙ্গে তার বিভিন্ন অঙ্গের যে সম্পর্ক ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যেও ঠিক সেইরকম সম্পর্ক। কাজেই ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক হল আঙ্গিক। সমাজকে এক জীবন্ত জীব বলা যায়, যে দেহ গড়ে উঠেছে পরস্পর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের সমন্বয়ে। যে কোনো প্রাণীদেহ বহুকোষ দ্বারা গঠিত, ঠিক তেমনি সমাজরূপ দেহের কোষ হল বিভিন্ন ব্যক্তি। মানবদেহে যেরকম ঐক্য দেখা যায়, সমাজদেহেও সেরকম ঐক্য দেখা — তা হল যথাযথ সংহতি। জীবদেহ ছাড়া যেমন তার বিভিন্ন অঙ্গগুলোর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভব নয়, তেমনি ব্যক্তির অস্তিত্ব সমাজদেহের জন্যই। বিভিন্ন অঙ্গের ক্রিয়ার উপর সমগ্র জীবদেহের সুস্থতা নির্ভর করে, তেমনি ব্যক্তিদের যথাযথ আচরণ ও ক্রিয়াকর্মের উপর সমাজের স্বাস্থ্য নির্ভরশীল।

প্রাচীন গ্রীক দর্শনে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের বক্তব্যের মধ্যে এই মতবাদের মূলসুর শোনা যায়। এই মতবাদের প্রবক্তা হলেন হার্বার্ট স্পেনসার — তিনি তার 'Principles of sociology' গ্রন্থে সমাজের সংগঠনকে একটি জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

স্পেনসারের মতে জীবদেহের সঙ্গে সমাজের কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়, সেগুলি হল —

1. সমাজ ও জীবদেহ উভয়েরই ক্রমবিকাশ ও বৃদ্ধি রয়েছে।
2. উভয়ক্ষেত্রেই বিকাশের ধারা — সরল থেকে জটিলের দিকে এগিয়ে যায়।
3. উভয়ক্ষেত্রেই গঠনের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কার্যবিভাগ লক্ষ্য করা যায়।
4. উভয়ক্ষেত্রেই যেহেতু অঙ্গগুলি পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ তাই প্রতিটি অঙ্গের কাযকর্ম সম্পাদনের উপর সমগ্রের সুস্থতা নির্ভর করে।

স্পেনসারের মতে সমাজ ও প্রাণীর মধ্যে গঠনগত মিল রয়েছে। জীবদেহের মতো সমাজদেহেরও তিনটি পদ্ধতি বা ব্যবস্থা রয়েছে, এই তিনটি ব্যবস্থা হলো —

POCO
M6 PRO KAKOLI

১. সংরক্ষণের ব্যবস্থা — প্রাণীদেহের বেঁচে থাকার জন্য একাধিক বিভিন্ন অঙ্গব্যবস্থার প্রয়োজন, যেমন - মুখ ও খাদ্যনালী — খাদ্যগ্রহণ ও পরিপাকের কাজ করে থাকে। ঠিক একইভাবে সমাজদেহেরও সংরক্ষণ ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উৎপাদন ব্যবস্থা — কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ও শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন। — যা সমাজকে টিকিয়ে রাখে।

২. বণ্টন ব্যবস্থা — সুষ্ঠু উৎপাদন জীবদেহে বণ্টনব্যবস্থার দ্বারা সারাদেহে রক্ত চলাচল হয় শিরা ও ধমনীর সাহায্যে, তেমনি সমাজদেহের বণ্টন ব্যবস্থা হল বিভিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা — ডাক, বেতার ও রেল।

৩. নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা — শরীরদেহের নিয়ন্ত্রক হল কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ঠিক তেমনি সমাজদেহেরও নিয়ন্ত্রিত হয় সরকার বা শাসনব্যবস্থার দ্বারা।

সমালোচনা

প্রথমত, জৈবিক মতবাদীরা সমাজকে একটি জীবদেহ হিসাবে উল্লেখ করেছেন কিন্তু জীবদেহ কথাটি সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা যুক্তিসম্মত নয়। স্পেন্সারের মতে সমাজ জীবদেহ, এই ধারণাকে বেশি গুরুত্ব দিলে, মানবসমাজে যে নির্বাচনের উপাদান আছে তাকে উপেক্ষা করা হবে।

দ্বিতীয়ত, জীবদেহের জন্মমৃত্যু আছে, কিন্তু সমাজের রূপ পরিবর্তনের সম্ভব। কেউ বৃদ্ধ হলেও সমাজের কখনো মৃত্যু হয়না।

তৃতীয়ত, জীবদেহ থেকেই জীবদেহের উৎপত্তি ঘটে, কিন্তু সমাজের উদ্ভব এইভাবে হয়না।